ময়ূরাক্ষীর তীরে প্রথম হিমু

হুমায়ূন আহমেদ

ময়ূরাক্ষীর তীরে প্রথম হিমু

হুমায়ূন আহমেদ



আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। লেকচারার থেকে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর হয়েছি। বেতন বাড়েনি, যন্ত্রণা বেড়েছে। আমাকে দূর-দূরান্তরে পরীক্ষা নিতে পাঠানো হচ্ছে। পটুয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর। কলেজগুলোতে পড়াশোনা হয় না বললেই চলে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সুযোগ-সুবিধাও নেই। ছাত্ররা কিছুই পারে না। অতি সহজ প্রশ্নে মাথা চুলকায়, ঘাড় চুলকায়। মাথা এবং ঘাড় থেকে প্রশ্নের উত্তর আসে না।

অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছে এমন ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস করি, পানির ফর্মূলা কী? সে আমতা আমতা করে বলে, H_2O। যেন তার সন্দেহ আছে আসলেই H_2O কিনা। তারপর জিজ্ঞেস করি, D_2O কী? যারা কেমিস্ট্রি জানেন না তাদের বলছি, D_2O হচ্ছে হেভি ওয়াটার। হাইড্রোজেন অ্যাটমে প্রটোন থাকে একটা, এখানে দুটা। D হলো হাইড্রোজেনের একটা Isotope। অতি সহজ এই প্রশ্নে পরীক্ষার্থী পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে বলে, স্যার হচ্ছে D_2O ঢাকার পানি। তাহলে রাজশাহীর পানির ফর্মূলাটা কী? স্যার R_2O। বরিশালের পানি? স্যার B_2O। বরগুনার পানি? এইবার ছাত্র উৎসাহী। সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। সে হাসিমুখে জবাব দেয়, বরগুনার পানিরও স্যার একই ফর্মূলা B_2O।

আমি হতাশ চোখে পরীক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে থাকি। ইন্টারনাল একজামিনার হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, পাস করিয়ে দিতে হবে স্যার। গরিবের ছেলে। কষ্ট করে লেখাপড়া করছে। ভাবটা এ রকম যে, ধনীর ছেলেমেয়েদের কেমিস্ট্রি জেনে পাস করতে হবে। গরিবের ছেলের পাসটা প্রয়োজন। কেমিস্ট্রি জানা প্রয়োজন না।

বাইরে পরীক্ষা নিতে গেলে ভাইভা বিষয়ক অতি ক্লান্তিকর অবস্থার ভেতর যেতে হয়। ছাত্রদের ফেল করাতে ইচ্ছা করে না, আবার পাস করাতেও ইচ্ছা করে না। ভাইভা নিতে কষ্ট। থাকা-খাওয়াতেও কষ্ট।

এক্সটারনাল শিক্ষকদের থাকার জায়গা হয় সাধারণত ল্যাবরেটরির লাগোয়া ঘরে। উদাহরণ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ। সেখানে পরীক্ষা নিতে গিয়ে ওই ঘরে অনেকদিন থেকেছি। একবার ভূতও দেখেছিলাম। যেসব কলেজে এ রকম কোনো ঘর নেই সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয় কোনো শিক্ষকের বাসায়। ভদ্রলোক হয়তো পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করছেন, সেখানে মূর্তিমান উপদ্রবের মতো অচেনা অজানা একজন মানুষ থাকতে আসেন। যাকে আপন করে নেওয়া যায় না, আবার দূরেও ঠেলে রাখা যায় না।

এক্সটারনাল ভদ্রলোক ইচ্ছা করলেই ভাইভায় প্রচুর ফেল করিয়ে ঝামেলা করতে পারেন। একবার কেমিস্ট্রির এক শিক্ষকের বাসায় আমার থাকার জায়গা হলো। ভদ্রলোকের বাসায় একটা বাথরুম। সেই বাথরুম স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরের সঙ্গে এটাচড। আমার আবার রাতে কয়েক দফা বাথরুমে যেতে হয়। ভদ্রলোক অবশ্য খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, আমার শোবার ঘরের দরজা খোলা থাকবে। আপনার যতবার ইচ্ছা বাথরুমে যাবেন। কোনো সমস্যা নেই।

দীর্ঘ ভূমিকা দিলাম, এখন মূল গল্পে আসি। আমি পরীক্ষা নিতে গেছি পটুয়াখালীতে। ল্যাবরেটরির পাশের টিচার্স রুমে খাট পেতে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গরমকাল। বেশির ভাগ সময় ইলেকট্রিসিটি নেই। ফ্যান চলে না।

প্রথম রাতে একফোঁটা ঘুম হলো না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করি। রাত তিনটায় মশারির ভেতর থেকে বের হলাম। সঙ্গে সঙ্গে শত শত মশা আমাকে ছেঁকে ধরল। আবার মশারির ভেতর ঢুকলাম। গরমে টিকতে না পেরে আবার বের হলাম। মশাদেরকে বললাম, তোমরা

যারা এখানে আছ তারাই আমার রক্ত খাও, বাইরে থেকে কাউকে ডেকে এনো না। ঘরটাকে আমার মনে হলো হাজতখানা। এই হাজতে সাতটা রাত পার করতে হবে ভেবে খুবই দমে গেলাম। এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কীভাবে? হঠাৎ করে মনে হলো একটা নদী কল্পনা করলে কেমন হয়?

নদীর পাড়ে একটা গাছের নিচে আমি বসে আছি। উথাল পাতাল হাওয়া নদীর উপর দিয়ে উড়ে আসছে। এমন হাওয়া যে আমার সামান্য শীত শীত ভাব হচ্ছে। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মশক বানিহীকে সম্পূর্ণ অগ্রহ্য করে নদী কল্পনা শুরু করলাম। নদীর একটা সুন্দর নামও দিলাম - ময়ূরাক্ষী। যারা আমার লেখা পড়ছেন তারা হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার গরম লাগা কমে গেল।

নদীর প্রবল হাওয়ায় মশারা উড়ে গেল। আমার খানিকটা শীত শীতও করতে লাগল। তৈরি হলো হিমু, যে যেকোনো অবস্থায় কল্পনার নদী ময়ূরাক্ষীর কাছে চলে যেতে পারে। হিমুকে নিয়ে লেখা আমার প্রথম উপন্যাসটির নাম ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর হিমু আমি নিজে। প্রথম লেখা হিমু বিষয়ক বইয়ে ময়ূরাক্ষী নদী কীভাবে চলে এল, একটু দেখা যাক।

'ছোটবেলার কথা। ক্লাস সিক্সে পড়ি। জিওগ্রাফি পড়ান মফিজ স্যার। তিনি ক্লাসে ঢুকলে চেয়ার-টেবিলগুলো পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে। স্যার মানুষটা ছোটখাটো, কিন্তু হাতের থাবাটা বিশাল। আমাদের ধারণা ছাত্রদের গালে চড় বসাবার জন্য আল্লাহতালা স্পেশালভাবে স্যারের এই হাত তৈরি করে দিয়েছেন। স্যারের চড়েরও নানা নাম ছিল - রাম চড়, শ্যাম চড়, যদু চড়, মধু চড়।

এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন চড় হচ্ছর রাম চড়, সবচেয়ে নরমটা হচ্ছে মধু চড়। স্যার সেদিন পড়াচ্ছেন - বাংলাদেশের নদ-নদী। ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, এই একটা নদীর নাম বল তো। চট করে বল। মফিজ স্যার কোনো প্রশ্ন করলে কিছুক্ষণের জন্য আমার মাথাটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায়। কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। মনে হয় মাথার খুলির ভেতর জমে থাকা কিছু বাতাস কানের পর্দা ফাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কী ব্যাপার চুপ করে আছিস কেন? নাম বল। আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, আড়িয়াল খাঁ। স্যার এগিয়ে এসে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। খুব সম্ভব রাম চড়। হুঙ্কার দিয়ে বললেন,

এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে তোর মনে এল আড়িয়াল খাঁ? সব সময় ফাজলামি? কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি কানে ধরে সারাটা ক্লাস দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘন্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক আগে পড়ানো শেষ করে স্যার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছে আয়।

আরেকটি বড় খাবার জন্য আমি ভয়ে ভয়ে স্যারের কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বিষন্ন গলায় বললেন, এখনো কানে ধরে আছিস কেন? হাত নামা। আমি হাত নামালাম। স্যার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তোকে শাস্তি দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে, খুবই অন্যায়। তোকে নদীর নাম বলতে বলেছি, তুই বলেছিস। আয় আরও কাছে আয়, তোকে আদর করে দেই।

স্যার এমন ভঙ্গিতে মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন যে আমার চোখে পানি এসে গেল। স্যার বিব্রত গলায় বললেন, আমি তোর কাছ থেকে সুন্দর একটা নদীর নাম শুনতে চেয়েছিলাম, আর তুই বললি আড়িয়াল খাঁ। আমার মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে। আচ্ছা এখন সুন্দর একটা নদীর নাম বল। আমি শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললাম ময়ূরাক্ষী।

ময়ূরাক্ষী? এই নাম তো শুনিনি। কোথাকার নদী?

জানি না স্যার।

এই নামে আসলেই কি কোনো নদী আছে?

জানি না স্যার।

স্যার হালকা গলায় বললেন, ‘আচ্ছা থাক। না থাকলে নেই। এটা হচ্ছে তোর নদী। যা জায়গায় গিয়ে বস। এমনিতেই তোকে শাস্তি দিয়ে আমার মনটা খারাপ হয়েছে। তুই তো দেখি কেঁদে কেঁদে আমার মন খারাপটা বাড়াচ্ছিস। আর কাঁদিস না।’

নয় নম্বর বিপদ সংকেত

পাঠকরা ভুলেও ভাববেন না ময়ূরাক্ষী বের হওয়ার পর পরই যুবক শ্রেণীর বিরাট অংশ হলুদ পাঞ্জাবী পরে রাস্তায় নেমে গেল। আমিও মনের আনন্দে একের পর এক হিমু বাজারে ছাড়তে লাগলাম। পাশ বইয়ের খাতায় টাকা জমা হতে লাগল। শুরুতে হিমুকে আমি মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করিনি। তখন আমার প্রিয় চরিত্র মিসির আলি। আমি লিখছি মিসির আলি। এই ভদ্রলোকের লজিকে এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ।

এর মধ্যে আমার অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব, ব্যাংক এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে ধার করে এলিফ্যান্ট রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছি। পনেরশ স্কয়ার ফিটের ছোট্ট ফ্ল্যাট। তাতে কী, দুটো বেডরুম আছে। একটা বারান্দা আছে। বারান্দায় বসলে সুন্দর কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাই না। জুতার দোকান দেখতে পাই। ছয়তলা থেকে জুতার দোকান দেখা খারাপ কিছু না।

বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে আমি জুতার দোকান দেখি এবং পরের লেখাটা কী হবে ভাবি। আমার তিন মেয়ে তখন সামান্য বড় হয়েছে। বড় মেয়েটি ক্লাস সিক্সে পড়ে, মেজোটি পড়ে ক্লাস ফোরে। ভোরবেলা স্কুলের পোশাক পরে তারা কিছুক্ষণ ধবল রঙের ডিপফ্রিজের সামনে দাঁড়ায়।

কারণ তাদের বাবা রাতে যা লিখেছে তা ডিপফ্রিজের উপর সাজানো থাকে। আমার এই দুই কন্যা বাবার লেখার সর্বশেষ অংশ না পড়ে স্কুলে যাবে না। আমার লেখক জীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার এই দুই কন্যার কোনো একজন, খুব সম্ভব বড়জন আমাকে একদিন বলল, বাবা ময়ূরাক্ষীর মতো আরেকটা বই লেখ। হিমুর বই।

হিমুকে নিয়ে কন্যার আগ্রহে লিখে শেষ করলাম দরজার ওপাশে। বই প্রকাশিত হলো। আমি পড়লাম মহাবিপদে। হাইকোর্টে বিচারকদের সমিতি আছে। সমিতির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, এই বইটি লিখে আমি মহা অন্যায় করেছি। মহান বিচারকদের সম্মান ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি লিখেছি জজ সাহেবরা ঘুষ খান।

উপন্যাসে ঘটনাটা এ রকম - হিমুর মাতুল বংশ পিশাচ শ্রেণীর। তারা হেন দুষ্কর্ম নাই যা করে না। তাদের ধারণা যেকোনো কাজ টাকা দিয়ে করানো সম্ভব। তাদেরই একজন জজ সাহেবকে ঘুষ দিয়ে এই কাজটা করাতে চাচ্ছে। জজ সাহেবরা ঘুষ খান - এটি হিমুর ধান্ধাবাজ মামার কথা। বইতে কিভাবে এসেছে দেখা যাক।

‘মামা গোসল করে জায়নামাজে বসে গেলেন। দীর্ঘ সময় লাগল নামাজ শেষ করতে। তার চেহারা হয়েছে সুফি সাধকের মতো। ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি। মোনাজাত করার সময় টপটপ করে তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আমি অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখলাম।

তারপর বল, কী ব্যাপার?

একজন লোক জেলখানায় আছে মামা। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার, দেখা করার কায়দা পাচ্ছি না। দরখাস্ত করেছি, লাভ হয়নি।

খুনের আসামি? তিনশ বারো ধারা?

কোন ধারা তা জানি না, তবে খুনের আসামি।

এটা কোনো ব্যাপারই না। টাকা খাওয়াতে হবে। এই দেশে এমন কোনো জিনিস নেই যা টাকায় হয় না।

টাকা তো মামা আমার নেই।

টাকার চিন্তা তোকে করতে বলছি নাকি? আমরা আছি কী জন্য? মরে তো যাই নাই। টাকা সঙ্গে নিয়ে আসছি। দরকার হলে জমি বেঁচে দেব। খুনের মামলাটা কী রকম বল শুনি। আসামি ছাড়ায়ে আনতে হবে।

তুমি পারবে না মামা। তোমার ক্ষমতার বাইরে।

আগে বল, তারপর বুঝব পারব কী পারব না। টাকা থাকলে এই দেশে খুন কোনো ব্যাপারই না। এক লাখ টাকা থাকলে দুটো খুন করা যায়। প্রতি খুনে খরচ হয় পঞ্চাশ হাজার। পলিটিক্যাল লোক হলে কিছু বেশি লাগে।

আমি মোবারক হোসেন সাহেবের ব্যাপারটা বললাম। মামা গালে হাত দিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। সব শুনে দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে বললেন, পুলিশের সাজানো মামলা, পেছনে আছে বড় খুঁটি। কিছু করা যাবে না। ট্রাইব্যুনাল করলে কোনো আশা নাই, সিভিল কোর্ট হলে আশা আছে। জজ সাহেবদের টাকা খাওয়াতে হবে। আগে জজ সাহেবরা টাকা খেত না। এখন খায়। অনেক জজ দেখেছি কাতলা মাছের মতো হাঁ করে থাকে। কেইস সিভিল কোর্টে উঠলে আমারে খবর দিয়ে নিয়ে আসবি।'

মামলা মোকদ্দমা বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সব সময় শুনেছি মামলা লোয়ার কোর্ট থেকে হাইকোর্টে যায়, তারপর সুপ্রিম কোর্টে। আমার বেলায় সরাসরি হাইকোর্ট থেকে তলব।

শুধু আমি একা আসামি তা কিন্তু না। আমাকে নিয়ে বিচারকরা মামলা করেছেন এই বিষয়টি যেসব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তারাও আসামি। তাতে আমার সুবিধা হলো, পত্রিকার সম্পাদকরা বড় বড় ব্যারিস্টার দিলেন। এই মুহূর্তে ড. কামাল হোসেন এবং ভাষাসৈনিক গাজিউল হকের নাম মনে পড়ছে।

পত্রিকার সম্পাদকরা উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং পার পেয়ে গেলেন। অ্যাটর্নি জেনারেল তার অফিসে আমাকে ডেকে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং বিতর্কিত বইটি বাজার থেকে উঠিয়ে নিলে আমার আর কোনো ঝামেলা হবে না।

আমি বললাম, ভুল করলেই ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্ন আসে। আমি ভুল করিনি। উপন্যাসের একটি দুষ্ট চরিত্র কী বলছে তার দায়ভার লেখকের না। তারপরেও যদি দায়ভার আমার থাকে তাহলে আমি জজ সাহেবরা ঘুষ খান এই মন্তব্য থেকে সরে আসব না। সব জজ সাহেবের কথা এখানে বলা হয়নি। জজ সাহেবরা ভিনগ্রহ থেকে আসেননি। মানুষের সাধারণ ত্রুটি তাদের মধ্যেও থাকবে। একজন লেখক হিসেবে আমি তা লিখব। আমাদের সংবিধান মতপ্রকাশের অধিকার দিয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন, আপনি কিন্তু বিপদে পড়বেন।

আমি বললাম, কী আর করা। না হয় একটু বিপদে পড়লাম।

মামলা শুরু হলো। আমি হাইকোর্টে যাই। সঙ্গে আমার তিন কন্যা এবং তাদের মা। তারা ভয়ে অস্থির, এই বুঝি আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মামলার এক পর্যায়ে তিন বিচারক নিয়ে গঠিত বেঞ্চের একজন বললেন, তিনি বিব্রত। মামলায় থাকবেন না। কিছুদিন পর আরেকটি বেঞ্চ তৈরি হলো।

সেই বেঞ্চের এক বিচারকও বললেন তিনি বিব্রত। পনেরো ষোল বছর তো হয়েই গেল, বিচারকরা আমার বিষয়ে বিব্রত রয়েই গেলেন। আমার খুব ইচ্ছা করে মামলাটা শেষ পর্যন্ত দেখতে। মামলায় আমি যদি জিতে যাই তাহলে প্রমাণ হবে জজ সাহেবরা সাধারণ লোভ লালসার ঊর্ধ্বে না। আর যদি হেরে জেলে যাই ততেও ক্ষতি নেই।

অতীতে এই পৃথিবীতে লেখার মাধ্যমে মত প্রকাশের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। আমি না হয় কিছুদিন জেলে থাকলাম। আমাকে জেলখানার মেঝেতে শুয়ে থাকতে হবে না। একুশে পদক পাওয়ার কারণে ডিভিশন দেওয়া হবে। বিছানায় ঘুমাব। ভাগ্য ভালো হলে মাথার উপর ফ্যান ঘুরবে। ফ্যান না ঘুরলেও ক্ষতি নেই, চোখ বন্ধ করে ময়ূরাক্ষী নদীকে জেলের ভেতর নিয়ে আসা কঠিন কোনো কাজ না।

হিমুর পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ

কলকাতা থেকে 'দেশ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়। একটা পত্রিকা কতদূর ক্ষমতাধর তা 'দেশ' পত্রিকা না দেখলে আমি জানতাম না। বলা হয়ে থাকে যেকোনো অগা মগা বগা লেখককে এই পত্রিকা আসমানে তুলে দিতে পারে। মহান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আবার সত্যিকারের মহান কোনো লেখককেও ধরাশায়ী করতে পারে।

এই পত্রিকায় কারও লেখা ছাপা হওয়ার মানে (বিশেষ করে শারদীয় সংখ্যায়) লেখক হিসেবে কপালে স্থায়ী সিল পড়ে যাওয়া। এই সিলের কালি অলেপনীয়, ধুলেও যাবে না। কপালে জ্বলজ্বল করতে থাকবে।

এক সকালে দেশ পত্রিকার এক প্রতিনিধি আমার বাসায় উপস্থিত। তার সঙ্গে নানা গল্প হচ্ছে। গল্প তিনি করছেন আমি শুনছি। আমি ক্লাসে যাব, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরে বলতেও পারছি না। হাজার হলেও বিদেশি মেহমান। এক পর্যায়ে ভদ্রলোক বললেন, আমরা আপনার একটা উপন্যাস শারদীয় সংখ্যায় ছাপাব। তবে দেশে ছাপাব নাকি আনন্দবাজারে ছাপাব, নাকি সানন্দায় ছাপাব তা বলতে পারছি না। সাগরময়দা ঠিক করবেন।

ভদ্রলোক হয়তো ধারণা করেছিলেন তার কথা শুনে আনন্দে আমি এমন লাফ দেব যে সিলিংয়ে মাথা ঠেকে যাবে। আমি তা না করে শুকনো গলায় বললাম, হুঁ। ভেবে দেখি।

কী ভাববেন? পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কত বড় সুযোগ।

আমি ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, ভাই আমি সুযোগ সন্ধানী মানুষ না। আমি লেখক। লেখক কখনো সুযোগের সন্ধান করে না। সুযোগ লেখকদের সন্ধান করে।

তার মানে আপনি লিখবেন না?

আমি বললাম, শুধুমাত্র দেশ পত্রিকা যদি তার শারদীয় সংখ্যায় লেখা ছাপে তাহলেই পাণ্ডুলিপি পাঠাব। দেশ পত্রিকা ছাড়া না।

ভদ্রলোক মোটামুটি হতভম্ব অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, যাই। নমস্কার।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম এই বিষয়ে আর কিছু শুনব না। আশ্চর্যের ব্যাপার, পনেরো দিনের মাথায় দেশ পত্রিকার সম্পাদক চিঠি দিয়ে জানালেন তারা আমার একটি উপন্যাস শারদীয় দেশ পত্রিকায় ছাপাতে চান। হিমুকে নিয়ে লেখা একটা উপস্যাস পাঠালাম। ছাপা হলো। পরের বছর আবার চিঠি এবারও তারা একটি উপন্যাস ছাপাবেন। পাঠালাম আরেকটা হিমু।

পর পর ছয় বছর কিংবা সাত বছর আমি শারদীয় দেশ পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছি। বেশির ভাগই হিমুবিষয়ক রচনা। পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা আমার সাহিত্য প্রতিভা (?) সম্পর্কে কোনো ধারণা পেয়েছেন কি না জানি না। হিমু বিষয়ে ভালোই ধারণা পেয়েছেন। তার প্রমাণও পেলাম।

কলকাতায় গিয়েছি কোনো এক বইমেলায়। সে দেশে চেহারা দেখে আমাকে কেউ চিনবে না, কাজেই লেখকসুলভ নকল গাম্ভীর্য নিয়ে হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন নেই। আমি মনের সুখে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে একজন আমার পা ছুঁয়ে বলল, দাদা আমি হিমু।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ধুতি পরা হিমু দেখছি। পাঞ্জাবি হলুদ রঙের। পায়ে জুতা নেই - খালি পা। লক্ষণ বিচারে হিমু তো বটেই।

আপনি কত দিন ধরে হিমু?

দুই বছরের উপর হয়েছে দাদা।

আমি বললাম, পাঞ্জাবির কি পকেট আছে?

পকেট নেই।

টাকা-পয়সা রাখেন কোথায়?

ভদ্রলোক পাঞ্জাবি উঠিয়ে দেখালেন, কোমরের কালো ঘুনসির সঙ্গে কাপড়ের ব্যাগ লাগানো - টাকা-পয়সা সেখানেই থাকে।

দাদা, আমি দুজনের ভক্ত। আপনার এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের। আপনাদের দুজনের ছবি ঠাকুরঘরে আছে।

আমি চমৎকৃত। সাত বছর দেশ পত্রিকায় লেখালেখির কারণে যদি কারও ঠাকুরঘরে ঢুকে যেতে পারি সেটা কম কী? গলায় সুর থাকলে গাইতাম 'অকত অধম জেনেও তো তুমি কম করে কিছু দাওনি।'

বিদেশে বেশ কিছু হিমুর দেখা পেয়েছি। বিদেশের হিমুরা কঠিন প্রকতির। একশ পার্সেন্ট খাঁটি ভেজালবিহীন হিমু। জার্মানির ফ্রাংকফুর্টের হিমুর কথা বলি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বরফ পড়বে পড়বে করছে, এখনো পড়া শুরু করেনি। এই ঠাণ্ডায় খালি পায়ে হলুদ পাঞ্জাবি পরে একজন উপস্থিত। গাল ভর্তি হাসি দিয়ে বলল, স্যার আমি হিমু।

কতদিন ধরে?

তিন বছরের বেশি হয়েছে। দেশেও হিমু ছিলাম।

ছেলেটা এমনভাবে কথা বলছে যে হিমু একটা ধর্ম। সে ধর্ম পালন করছে। এর বেশি কিছু না। আমি হিমু ধর্ম প্রচারক।

গত বইমেলায় এক কাণ্ড ঘটল। মধ্যবয়স্ক একজন ভিড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, স্যার, আমি ঠিক করেছি মার্চের তিন তারিখ থেকে হিমু হব। হিমু হওয়ার নিয়মকানুন কী?

আমি বললাম, মার্চের তিন তারিখ থেকে কেন?

আমার জন্মদিন মার্চের তিন। এখন স্যার নিয়মকানুন বলেন।

আমি নিয়মকানুন কী বলব? ভদলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমাকে উদ্ধারের জন্য অন্যপ্রকাশের কমল এগিয়ে এল। সে গম্ভীর গলায় বলল, নিয়মকানুন সব বইয়ে দেওয়া আছে। বই পড়ে জেনে নিন। হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে হাঁটবেন। এইটাই প্রাথমিক বিষয়।

প্রতি পূর্ণিমায় জোছনা দেখতে জঙ্গলে যেতে হবে?

গেলে ভালো হয়, তবে দু-একটা মিস হলেও ক্ষতি হবে না।

হিমু হওয়ার নিয়মাবলি

বইমেলার ওই ঘটনার পর আমি হিমু হওয়ার নিয়মকানুন নিয়ে ভেবেছি। কিছু নিয়ম এখানে দিয়ে দিলাম। আরও কিছু মনে এলে সংশোধনী দেওয়া হবে।

হিমু হওয়ার নিয়মাবলি :

১। বয়স আঠারোর উপর হতে হবে। আঠারোর নিচে হিমু হওয়া যাবে না। বিশেষ ব্যবস্থায় আঠারোর নিচেও হিমু হওয়া যাবে, তখন বাবা-মা এবং স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের অনুমতি লাগবে।

২। হলুদ পাঞ্জাবি বাধ্যতামূলক। শীতকালে হলুদ চাদর পরা যেতে পারে। বাংলাদেশের সীমানার বাইরের হিমুরা হলুদ পাঞ্জাবির বদলে হলুদ শার্ট বা জ্যাকেট পরতে পারবে।

৩। খালি পা বাধ্যতামূলক না। কম দামি চামড়ার স্যান্ডেল পরা যেতে পারে। শীত প্রধান দেশের হিমুরা জুতা-মোজা পরতে পারবে।

৪। প্রতি পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা বাধ্যতামূলক। মেঘ-বৃষ্টির কারণে চাঁদ দেখা না গেলে কল্পনায় চাঁদ দেখতে হবে।

৫। বৃষ্টি বাদলার দিনে ছাতা ব্যবহার করা যাবে না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যেতে হবে। ঠাণ্ডা লেগে গেলে চিকিৎসা নিতে হবে। হিমুরা শরীর ঠিক রাখার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে। এতে কোনো বাধা নেই।

৬। রাতে নির্জন রাস্তায় হাঁটার বিধান শিথিলযোগ্য। বইপত্রে দেখা যায়, হিমুরা সন্ত্রাসী এবং পুলিশের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে। নব্য হিমুদের এই কাজ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হচ্ছে। র্‍যাবের হাত থেকে শত হস্ত দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭। হিমুরা কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থনকারী হতে পারবে না। তাদের একটাই নীতি হিমুনীতি, রাজনীতি নয়।

৮। হিমুদের জন্য সপ্তাহে দুইদিন নিরামিষ আহার বাধ্যতামূলক। বাকি দিনগুলোতে মনের সুখে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

৯। হিমুদের পাঞ্জাবিতে পকেট থাকে না। তবে কেউ যদি পকেট রাখেন তবে দোষ হবে না।

১০। হিমুরা কখনোই মানিব্যাগ ব্যবহার করতে পারবে না।

১১। তারা সব সময় হাস্যমুখে থাকবে, সবার সঙ্গে ঠাট্টা ফাজলামি ধরনের কথা বলবে, তবে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্যদের সঙ্গে কখনো না। তারা ঠাট্টা ফাজলামি বুঝে না।

১২। আদি হিমুর পিতা যেসব নীতিমালা হিমুর জন্য লিখে গেছেন সেইসব নীতিমালা নিয়মিত পাঠ করতে হবে। সেই মতো জীবনচর্যাও পরিচালিত করতে হবে।

১৩। হিমুরা কখনোই কোনো তরুণীর সঙ্গে হৃদয়ঘটিত ঝামেলায় জড়াবে না। একসঙ্গে ফুচকা খাওয়া, ফাস্টফুড খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৪। এক হিমু অন্য হিমুকে আপন ভাইয়ের মতো দেখবে।

১৫। বিশেষ বিশেষ উৎসবে, যেমন পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারিতে সব হিমুরা একত্রিত হয়ে হিমু সঙ্গীত গাইবেন। হিমু সঙ্গীত এখনো লেখা হয়নি। সঙ্গীত লেখা এবং সুর দেওয়া হিমু গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

অসুস্থতা নাকি অন্য কিছু?

গুলশান এলাকায় মুক্তি নামের একটা ক্লিনিক আছে। মানসিক রোগী, ড্রাগ অ্যাডিক্ট ধরনের সমস্যার চিকিৎসা করা হয়। মুক্তি ক্লিনিকের একজন চিকিৎসক (ঢাকা মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের প্রফেসর) একদিন আমাকে ক্লিনিকে ডেকে পাঠালেন। তার কিছু বিশেষ ধরনের রোগীর চিকিৎসায় আমার সাহায্য প্রয়োজন।

আমি অবাক হয়েই গেলাম। ভদ্রলোক অভিযোগের মতো করে বললেন, আপনি এসব কী করছেন? লেখার মাধ্যমে সমাজে অসুস্থতা ছড়াচ্ছেন? হিমু আবার কী?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে হিমু কী ব্যাখ্যা করলাম। প্রফেসর সাহেব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন না। গলা কঠিন করে বললেন, হিমু উপন্যাসের কোনো চরিত্র না। হিমু হলো একটা ব্যাধির নাম। তা কি আপনি জানেন?

আমি জানি না।

হিমু ছোঁয়াচে ধরনের ব্যাধি। কনটেজিয়াস ডিজিজ। এই ডিজিজ আপনি ছড়াচ্ছেন। আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছেন। অবশ্যই আপনার লেখালেখি বন্ধ করে দেওয়া দরকার। লেখকরা সমাজের উপকার করেন। আপনি করছেন অপকার। ইজ ইট ক্লিয়ার?

এখনো 'ক্লিয়ার' না। আপনি ব্যাখ্যা করলে বুঝব।

ডাক্তার সাহেবের কাছে জানলাম, মুক্তি ক্লিনিকে অনেক বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার জন্য পাঠান যারা 'হিমু' নামক অদ্ভুত অসুখে ভুগছে। এরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়। কয়েকদিন কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, ঐশ্বরিক কিছু ক্ষমতা তাদের হয়েছে। তারা যা বলবে তাই হবে।

আমি বললাম, এই মুহূর্তে আপনার ক্লিনিকে কি কোনো হিমু আছে যার চিকিৎসা চলছে? ডাক্তার সাহেব দু:খিত গলায় বললেন, তিনজন ছেলে হিমু আছে। একটা আছে মেয়ে হিমু। মেয়ে হিমুর কী আলাদা নাম আছে?

আমি বললাম, মেয়ে হিমুর আলাদা কোনো নাম নেই। মেয়ে হিমুও হিমু। যদিও কেউ কেউ বলেন হিমি। আমার হিমি পছন্দ না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, যে তিন ছেলে হিমু আছে তার দুটা হিমু হওয়ার পরে ড্রাগ ধরেছে। ভয়ঙ্কর একডিলিউশনে ভুগছে। আসুন আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেই। কী প্রচণ্ড ডিলিউশনে যে এরা ভুগছে দেখে আপনারই খারাপ লাগবে।

আমি ওদের দেখতে গেলাম। সত্যি মনটা খারাপ হলো। জীবনের আনন্দে এদের ঝলমল করা উচিত ছিল। তা না, স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ক্লিনিকে। চোখের দৃষ্টিতে ঘোর। জীবন থেকে বিতাড়িত কিছু যুবক। আমি তাদেরকে ব্যাখ্যা করলাম যে, হিমু ফিকশন ছাড়া কিছু না। হিমুর চিন্তাভাবনা বা হিমুকে নিয়ে লেখকের চিন্তাভাবনা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার কিছু নেই। যেহেতু হিমুকে নিয়ে বইগুলো আমি লিখেছি, আমি জানি।

যুবকদের ভেতর একজন চাপা গলায় বলল, হিমুর বিষয়ে আমরা যা জানি আপনি তা জানেন না। আমি চমৎকৃত হয়ে বললাম, তোমরা কী জানো?

যুবক গলা আরও নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, প্রতিটা বড় শহরে একজন প্রধান হিমু থাকেন। তিনি শহর কন্ট্রোল করেন। অনেক রাতে হাঁটাহাঁটি করলে উনার দেখা পাওয়া যায়।

উনি কী পীর টাইপ কেউ?

উনি পীরের বাবা!

যারা পীরের বাবার দেখা পেয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। আমি চুপ করে গেলাম। একটা বিষয় আমাকে অবাক করল, হিমুর লেখককে নিয়ে তাদের নিস্পৃহতা। হিমুর যে জগৎ তারা তৈরি করেছে সেখানে আমার স্থান নেই।

চিকিৎসাধীন মহিলা হিমুকে দেখতে গেলাম।

কলেজ পড়া বাচ্চা একটা মেয়ে। সে কোনো এক হিমুর বইতে পড়েছে গভীর রাতে নির্জন রাস্তাগুলো সব নদী হয়ে যায়। হিমুরা সেই নদী দেখতে পায়। কাজেই এই মেয়ে রাস্তার নদী হওয়ার দৃশ্য চাক্ষুষ দেখার জন্য এয়ারপোর্ট চলে গেল। অনেক দূর দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে চলে গেল রানওয়েতে। গভীর রাতে রানওয়ের মাঝখানে ঘাপটি মেরে বসে রইল।

কোনো এক বিমানের পাইলট ল্যান্ড করতে এসে এই দৃশ্য দেখে প্রায় ভিরমি খেলেন। জানালেন কন্ট্রোল টাওয়ারকে। পুলিশ এসে মেয়েটিকে গেপ্তার করল। মেয়ের মা উপায় না দেখে তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করলেন।

মেয়েটি এখন সুস্থ। মেয়ের মা মেয়েকে নিয়ে নুহাশ পল্লীতে এসেছিলেন। আমি তাকে দিয়ে মিউজিক ভিডিওতে কিছু কাজও করিয়েছি। হিমুর এই ব্যাপারে আমি বুঝতে পারছি না। কেন কিছু মানুষ হিমুকে সত্যি ভাববে? এদের 'সাইকি' কি আলাদা?

নিউইয়র্কের এক মহিলার কথা বলি। বাঙালি মহিলা। স্বামীর সঙ্গে বাস করেন। স্বামী ট্যাক্সি চালান। তিনি নিজেও ইন্ডিয়ান শাড়ির দোকানে সেলস গার্লের চাকরি করেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছে। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, হুমায়ূন ভাই, হিমু নিউইয়র্কে বেড়াতে এসেছে এরকম একটা উপন্যাস লিখুন।

আমি বললাম, লেখা যেতে পারে।

ভদ্রমহিলা বললেন, হিমুর আসা-যাওয়ার খরচ আমি দেব। সে আমাদের বাসায় থাকবে।

এবার আমি চমকালাম। উপন্যাসের একটি চরিত্রের জন্য আসা-যাওয়ার খরচ দিতে হয় না। তার ঘুমুবার জন্য খাট লাগে না। আমি বললাম, হিমু আপনার বাড়িতে থাকবে?

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ। তার সঙ্গে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে। সে যে কদিন আমার সঙ্গে থাকবে আমি কাজ করব না। ছুটি নেব।

আমি বললাম, আপনি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন হিমু বলে কেউ নেই। হিমু আমার কল্পনার একটি চরিত্র।

ভদ্রমহিলা রাগত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি তাকে নিউইয়র্কে আনতে রাজি না সেটা সরাসরি বললেই হয়। অযুহাত দেওয়া শুরু করেছেন।

আমি চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমার মধ্যেও বিভ্রম তৈরি হলো। আসলেই হিমু বলে কেউ আছে না কি?

হিমু সড়ক

হিমুদের প্রধান কর্মকাণ্ড রাস্তায় রাস্তায় হাঁটা। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাদের নামে একটা রাস্তার নাম হতে পারে। হিমু সড়ক কিংবা হিমু এভিনিউ। সেই সম্ভাবনা কীভাবে তৈরি হলো তার গল্প বলি।

আমার মাথায় একবার ভূত চাপল অতি আধুনিক রেসিডেন্সিয়াল স্কুল করার। স্কুলটা হবে কুতুবপুরে আমার গ্রামের বাড়িতে। আদর্শ স্কুল - যা হবে এ দেশের রোল মডেল। আমি বেলাল বেগ নামের এক উদ্যোগী এবং স্বপ্নস্রষ্টা মানুষকে যাবতীয় দায়িত্ব দিলাম। স্কুলের জন্য জমি কিনতে শুরু করলাম।

বেলাল বেগ ঢাকা-কুতুবপুর ছোটাছুটি করতে লাগলেন। মেহের আফরোজ শাওন স্কুলের ডিজাইন করতে বসল। আমাদের সবার মধ্যে বিপুল উৎসাহ। এর মধ্যে বেলাল বেগ আমাকে নিয়ে গেলেন এলজিইডি অফিসে। সেই অফিস প্রধান কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীও একজন কর্মযোগী মানুষ। তাকে বলেকয়ে স্কুলের রাস্তাটা পাকা করানো যায় কি না।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে বেশ কিছু মিটিং সারলেন। বসে থাকতে থাকতে আমি নিজে ক্লান্ত এবং কিছু পরিমাণে বিরক্ত। যতবার চলে আসতে চাই বেলাল বেগ আমার হাত চেপে ধরেন। নিচু গলায় বলেন, আরেকটু অপেক্ষা করুন। আমাদের 'কন্যাদায়'।

এক সময় অতি ক্লান্ত মুখে সিদ্দিকী সাহেব এলেন। বেলাল বেগ নানা যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাচ্ছেন স্কুলের জন্য পাঁচ কিলোমিটার পাকা রাস্তা যে কত জরুরি। সিদ্দিকী সাহেব খুব যে মন দিয়ে তার কথা শুনছেন এরকম মনে হলো না। এক সময় তিনি বেলাল বেগের কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু ব্যাপারটা কী বলুন তো?

আমি গেলাম হকচকিয়ে। সিদ্দিকী সাহেব বললেন, আমার বড় ছেলেটা কিছুদিন হলো হিমু হয়েছে। হলুদ পাঞ্জাবি পরে ঘুরছে।

আমি হেসে ফেললাম। হিমু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম। সিদ্দিকী সাহেব বললেন, আপনারা খাবার না খেয়ে যেতে পারবেন না। বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে আমার জন্য খাবার আসে আসুন তিনজন মিলে খাব। হয় যদি সুজন তেঁতুল পাতায় নয়জন।

খাবার টেবিলে সিদ্দিকী সাহেব বললেন, এক মাসের মধ্যে যদি রাস্তাটা পাকা করে দেই তাহলে কি চলবে?

আমি হতভম্ব। এক মাসে রাস্তা। এও কি সম্ভব? ভদ্রলোক সম্ভব করলেন। এক মাসের আগেই রাস্তা পাকা হয়ে গেল। আমি ঠিক করলাম, রাস্তার নাম দেব 'হিমু সড়ক'। কারণ রাস্তা পাকা করার পেছনে হিমুর সামান্য হলেও ভূমিকা আছে।

হিমু সড়ক নাম রাখা হলো না। অঞ্চলের লোকজন মিটিং করে রাস্তার নাম রাখল ফয়জুর রহমান আহমেদ সড়ক। ফয়জুর রহমান আহমেদ আমার বাবা। সেই অর্থে রাস্তা হলো হিমুর দাদাজানের নামে। এইটাই বা খারাপ কী?

একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম-মৃত্যু

অধ্যাপক ইউনূস সাহেবের এক যুগ আগে বর্তমান চলমান রাজনীতিতে হতাশ হয়ে আমরা একটা রাজনৈতিক দল করেছিলাম। দলের নাম 'হিমু দল', ইংরেজিতে হিমু পার্টি। দলের জন্য হলুদ কাগজে প্যাড ছাপানো হলো। রাত জেগে গঠনতন্ত্র লেখা হলো। তিনটি স্তম্ভের ওপর দল। প্রথম স্তম্ভ সততা। দ্বিতীয় স্তম্ভ সততা। তৃতীয় স্তম্ভ সততা।

অসৎ রাজনীতিবিদদেরও দলে আনার বিধান ছিল। তারা প্রথমে যাবে বায়তুল মোকাররমে। সেখানকার খতিব তাদের তওবা পড়াবেন। এরপর আসবেন শহীদ মিনারে। সেখানে তাদের সততার পরিমাণ অনুযায়ী কানে ধরে উঠবস করবেন। তারপর সোনা-রুপার পানি দিয়ে তাদের গোসল করিয়ে হলুদ পাঞ্জাবি পরিয়ে দেওয়া হবে। দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যদি কেউ অন্যায় করেন, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিঝুম দ্বীপে। দ্বীপে পাঠানোর আগে কপালে সিল দিয়ে দেওয়া হবে। সিলে বাংলা এবং ইংরেজিতে লেখা থাকবে - অসৎ - Dishonest।

সৎ মানুষের খোঁজে আমাদের লোকজন ঘুরে বেড়াবে। জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেননি এবং মিথ্যা কথা বলেননি - এমন লোককে বানানো হবে প্রেসিডেন্ট।

সাংসদদের সাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে। কারণ তারা সাইকেলে করে অঞ্চল ঘুরে বেড়াবেন। সংসদ চলাকালীন সময়ে তারা শুধু ঢাকায় আসবেন, বাকি সময়টা থাকতে হবে অঞ্চলে।

মন্ত্রীরা মন্ত্রীপাড়ায় থাকবেন না। তাদের জন্য লম্বা টিনের চালা করে চৌকি পেতে দেওয়া হবে। হোস্টেলের মতো ব্যবস্থা। তারা সচিবালয়ে হেঁটে যাতায়াত করবেন।

আলাদা কিছু মন্ত্রণালয় খোলার পরিকল্পনা আমাদের ছিল, যেমন ভিক্ষুক মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় শুধু যে দেশের ভিক্ষুকদের সমস্যা দেখবে তা না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা আনার

ব্যাপারটাও তারা দেখবে। হাসি মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় দেখবে দেশের মানুষ যেন হাসতে পারে ইত্যাদি।

হিমু পার্টি গঠনের পর সপ্তাহে একদিন পার্টির বৈঠক বসতে লাগল। আমরা চাঁদাবাজিও শুরু করলাম। পার্টির জন্য চাঁদা তোলা হতে লাগল। মেম্বাররা প্রতি সপ্তাহে যার যা মন চায় চাঁদা একটি কাঠের বাক্সে জমা করতে লাগলেন। মাসের শেষে দেখা গেল, নয় শ টাকা হয়েছে। এই টাকায় পার্টির কাউন্সিল মেম্বাররা একটা করে হলুদ পাঞ্জাবি এবং চাদর কিনলেন। দলের টাকা ব্যক্তিগত হলুদ পাঞ্জাবির পেছনে খরচ করার কারণে কাউন্সিল মেম্বাররা আজীবনের জন্য হিমু রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিমু দলও বাতিল হয়ে গেল।

হিমুর বিয়ে

আমাদের দখিন হাওয়ার ছাদে অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নিষাদ হুমায়ূনের নামকরণ অনুষ্ঠান। হৈচৈ হচ্ছে, গান-বাজনা হচ্ছে। হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার। তিনি ঢাকায় এসেছেন এটা জানি। কোথায় উঠেছেন জানতাম না বলেই নিমন্ত্রণ করা হয়নি। অনেকদিন পর তাকে দেখে ভালো লাগল।

আমি তার হাত ধরতেই তিনি ধমকের গলায় বললেন, আপনি নাকি হিমুকে বিয়ে দিয়েছেন। এটা তো আপনি করতে পারেন না। হিমু কেন বিয়ে করবে?

আমি হিমুর বিয়ে দেইনি। একটা বই লিখেছি - আজ হিমুর বিয়ে। বইটিতে হিমু বিয়ে করে ফেলে জাতীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। বইটির প্রকাশক অন্যপ্রকাশ। প্রায় নিয়মিতই তারা বইমেলা উপলক্ষে হিমু বিষয়ক একটা বই পায়। বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে নানা আয়োজন করে। এইবার বিয়ের আয়োজন করে ফেলল। একজন পাগড়ি মাথায় বর সাজল, আরেকটি মেয়ে সাজল বউ। বর-কনে অন্যপ্রকাশের স্টলে বসে রইল। দর্শকদের আগ্রহ এবং কৌতূহল তুঙ্গ স্পর্শ করল। চারদিকে দারুণ উত্তেজনা। বইমেলায় এমন মজার দৃশ্য আগে হয়নি। দু-একজন অবশ্য গম্ভীর গলায় বললেন, বইমেলার শুচিতা নষ্ট হচ্ছে। মহান একুশের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে ইত্যাদি।

হিমুর বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম না। টেলিভিশনে দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, মেলা মানেই আনন্দ। মেলার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সবাই অজু করে মেলায় আসবেন এবং ফিসফিস করে কথা বলবেন তা কেন হবে? একজন প্রকাশক যদি বুক প্রমোশনের জন্য কিছু করেন তাতেই বা দোষ কোথায়?

ফ্রাংকফুর্ট বইমেলায় দেখেছি, রান্নার বই প্রকাশনা উপলক্ষে রান্নার বিপুল আয়োজন। বইয়ের রেসিপি দেখে রান্না হচ্ছে। সবাই মহানন্দে খাচ্ছে। একদিকে নাচের জলসা হচ্ছে। একদল ছেলেমেয়ে উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। বইমেলার ভেতরই বিয়ারের দোকান খোলা। প্রচুর বিয়ার খাওয়া হচ্ছে।

থাক এসব কথা, বিবাহ অনুষ্ঠানে ফিরে যাই। হিমু যে হয়েছে সে মৈনাক পর্বতের কাছাকাছি। কনে লাক্স সুন্দরী। যথেষ্টই রূপবতী। একদল হিমু গেল রেগে। তারা মৈনাক পর্বতকে হিমু মানতে রাজি না। পাল্টা মিছিল শুরু হলো -

'হিমুর বিয়ে, মানি না মানি না।'

অনেকদিন আগে বিশ্বকাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েছিল। আমি তখন ময়মনসিংহে অয়োময় নাটকের শুটিংয়ে ব্যস্ত। আর্জেন্টিনার পরাজয়ে বিশাল মিছিল বের হলো। স্লোগান - 'আর্জেন্টিনার পরাজয়, মানি না মানি না।'

তারা জানে 'মানি না মানি না' বলে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কিছু হবে না। তারপরেও স্লোগান দিতে হবে। জাতিগতভাবে আমরা স্লোগান দিতে ভালোবাসি। বাকের ভাইয়ের ফাঁসি বন্ধ করার জন্য স্লোগান দিয়েছিল। হিমুর বিয়ে বন্ধ করার জন্যও স্লোগান। বেচারা হিমু কি কোনোদিনই বিয়ে করতে পারবে না? তার সুখী সুন্দর সংসার হবে না? কোনো শিশু হিমুকে 'বাবা' বলে ডাকবে না? এত নিষ্ঠুর কেন আমরা?

বালক হিমু

পাঁচ-ছয় বছর আগে আমি অতি দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। একা একা থাকি দখিন হাওয়ার এক ফ্ল্যাটে। নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। মাঝে মধ্যে নুহাশ আসে। হোটেল থেকে খাবার এনে দুজন মিলে খাই। সে কিছুক্ষণ থাকে। দুজন নানা বিষয়ে গল্প করি। একদিন সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে উপস্থিত। আমি বললাম, বাবা পাঞ্জাবিটা সুন্দর তো!

সে খুশি খুশি গলায় বলল, মেজপা (শীলা) নিজের হাতে বানিয়েছে।

আমি বললাম, ভালো বানিয়েছে।

নুহাশ বলল, বাবা এটা হিমু পাঞ্জাবি। আমি হিমু হয়েছি।

আমি হিমুর পিঠে হাত রাখলাম। তাকিয়ে থাকলাম জানালার দিকে। কারণ চোখে পানি এসে যাচ্ছে। আমি চাচ্ছি না বালক হিমু পিতার চোখের পানি দেখুক।

দিন পনেরো আগের কথা। লেখালেখি করছি। হঠাৎ ধুপ করে আমার কোলে কী যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখি, সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নিষাদ হুমায়ূন। বয়স দুই মাস। তার মা তাকে সাজিয়ে এনে আমার কোলে ছেড়ে দিয়েছে। শাওন বলল, ছেলেকে দেখে কিছু কি বোঝা যাচ্ছে?

আমি বললাম, না।

ভালো করে তাকিয়ে দেখ।

আমি ভালো করে দেখলাম, কপালে কাজলের ফোঁটা ছাড়া আলাদা কিছু পেলাম না।

শাওন বলল, সে যে হিমু হয়েছে, এটা বুঝতে পারছ না? হলুদ পাঞ্জাবি, খালি পা।

আমি বললাম, আরে তাই তো!

দুই মাসের শিশু হিমু মহানন্দে হাত-পা ছুড়ছে। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, রাস্তায় ছেড়ে দিলেই সে হাঁটতে শুরু করবে। একবারও পেছন ফিরে তাকাবে না। হিমুরা কখনো পেছনে তাকায় না। হিমু আইনে পেছনে ফিরে তাকানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারা তাকিয়ে থাকবে ভবিষ্যতের দিকে।

****